বিকল্প আয় নিশ্চিত না করে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা নয়, সব জেলেকেই রেশনের আওতায় আনতে হবে

মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ে প্রতি জেলেকে মাসে ৮০০০ টাকা ভাতা দিবে

সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা ও তার প্রভাব

গত ২০ মে থেকে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিনের জন্য বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। ইলিশের জাটকা নিধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সফলতাকে অনুসরণ করে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য ও মূল্যবান প্রাণিজ সম্পদের ভাণ্ডার সুরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময় জেলে পরিবারগুলোকে বিশেষ সহযোগিতা করার জন্য চাল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যদিও তা অপ্রতুল এবং বরাবরের মতো অব্যবস্থাপনায় পর্যবসিত। দেশে ১২টি উপকূলীয় জেলায় নিবন্ধিত জেলে আছে প্রায় ৪ লাখ। যা মোট প্রকৃত জেলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। তার মানে বেশির ভাগ জেলেই নিবন্ধনের বাইরে রয়ে গেছেন। এছাড়াও আছেন বিপুল সংখ্যক মৎসশ্রমিক, যাদের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে সমুদ্রগামী জেলে নৌকার উপর নির্ভরশীল। এদের কোনো ধরনের নিবন্ধন নেই। শুধু মহেশখালী দ্বীপেই আছেন প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক, যারা অগ্রিম বেতন নিয়ে নিজেদের সারা বছরের জন্য অনেকটা ক্রীতদাস হিসেবে মহাজনের নৌকায় বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত।

আবার যারা নিবন্ধিত, তাদের সবাই সরকারী ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় আসেন না। যেমন, কক্সবাজার জেলায় নিবন্ধিত প্রায় ৪৮ হাজার জেলের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন রেশনের আওতায় আসবেন মাত্র ১০ হাজারের মতো জেলে। তাহলে এই দরিদ্র জেলে পরিবারগুলোর সংসার চলবে কিভাবে?

সমুদ্রে মৎস সম্পদ সুরক্ষায় মূল অন্তরায় কোনটি?

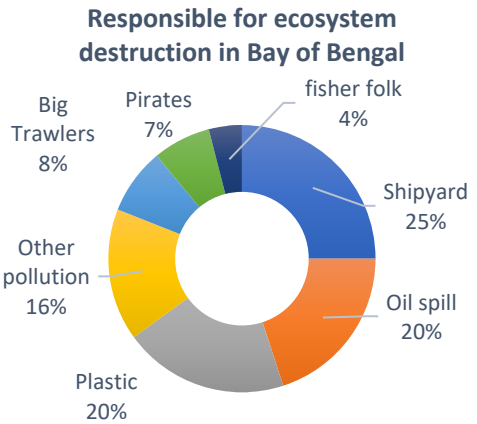

দেশের মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক বটে। তবে, সবার আগে দেখা দরকার সামুদ্রিক সম্পদ সুরক্ষার পেছনে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কোনটি। নিচের গ্রাফের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সামুদ্রিক সম্পদ সুরক্ষার পেছনে সবচেয়ে ছোট অন্তরায়টি হচ্ছে ক্ষুদ্র মৎসজীবীদের মাছ ধরা, মাত্র ৪%। অন্যদিকে, বঙ্গোসাগরে মাছসহ সামুদ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র ধ্বংসে বেশি অবদান রয়েছে ভাটিয়ারির জাহাজ ভাঙা শিল্প ও চট্টগ্রাম ও মংলার বহির্নোঙরে বড় বড় বিদেশি জাহাজের বর্জ নিষ্কাশন, সমুদ্রে ও নিকটবর্তী নদীর মোহনায় তেলবাহী জাহাজডুবি, বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক ও অন্যান্য দূষণ এবং বড় বড় ট্রলার দিয়ে মাছ আহরণ ও বিদেশি জেলেদের অবৈধ মাছ ধরা।

বিগত ৩-৪ বছরে সুন্দরবন এবং হালদা ও ফেনী নদীতে তেলবাহী জাহাজডুবির ঘটনায় মোট ১৫ লাখ লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ে যা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে নিপতিত হয়। কর্ণফুলি ও মেঘনার মোহনা ছাড়াও খুলনা সাতক্ষীরার নদী দিয়ে প্রতিবছর ৬ হাজার টন প্লাস্টিক বঙ্গোপসাগরে নিপতিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া বিভিন্ন ময়লা আর্বজনার ৬০% হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য। কক্সবাজারের লাবনি এবং ইনানী বিচ এবং চট্টগ্রামের আনন্দবাজার ও পতেঙ্গা এলাকার ১৮.৫ কিমি এলাকায় পাওয়া ৬৭০৫টি বর্জ্যের মধ্যে ২১৮২টিই ছিল প্লাস্টিক ব্যাগ। উপকূল দূষিত হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী বাণিজ্যিক জাহাজ, বিভিন্ন ধরনের ফেরি, এবং তেলবাহী বিভিন্ন জাহাজ।

বড় বড় ট্রলার মেশিনের মাধ্যমে জাল টেনে অতি ক্ষুদ্র জাতের মাছসহ সমুদ্রের তলদেশের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ তুলে নিয়ে আসে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন বা সাধারণ সময়ে ভারত, থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের বড় জেলে নৌকা অবৈধভাবে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ সীমানায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরে নিয়ে যায়, যা বন্ধ করার কোনো সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই।

ভারতে নিষেধাজ্ঞার উদাহরণ

ভারতের উড়িষ্যা ও তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারও ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত , দুই মাস, সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কিন্তু উভয় রাজ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র মাছ ধার যান্ত্রিক ট্রলারগুলোর জন্য, সাধারণ জেলেদেরকে রাখা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে। তাছাড়া তামিলনাড়ু সরকার নিষেধাজ্ঞা কালীন সময়ে প্রতি জেলেকে ৫০০০ রুপি করে অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে নিবন্ধিত জেলেদের একটি অংশকে দেওয়া হবে ৪০ কেজি করে চাল।

মৎস্য সম্পদের পরিমাণ জানতে হবে আগে

দেশের মোট মৎস্য আহরণে সামুদ্রিক মাছের অবদান প্রতিনিয়ত কমছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে দেশে মোট আহরিত মাছে সামুদ্রিক মৎস্যের অংশ ছিল ২১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা নেমে দাঁড়ায় ২০ দশমিক ৬ শতাংশে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা আরো কমে দাঁড়ায় ১৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশে, ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৭ দশমিক ৭৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৬ দশমিক ২৮ শতাংশে। আমাদের সমুদ্র এলাকায় কোন অংশে কী মাছ রয়েছে, মাছের মজুদ কী ধরনের, সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই আমাদের। ২০১৬ সালের নভেম্বরে আরভি মীন সন্ধানী জাহাজের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে দেশে সামুদ্রিক মৎস্য নিয়ে জরিপ কার্যক্রম বন্ধ ছিল প্রায়

তিন দশকের মতো। অন্যদিকে মীন সন্ধানীর জরিপকাজেও কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা বাড়াতে হবে: বন্ধ করতে হবে মাছ ধরার ক্ষতিকর উপায়গুলো

বর্তমানে আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার সক্ষমতা রয়েছে মাত্র ২৪৭টি জাহাজের। অন্যদিকে দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার জন্য ব্যবহার হচ্ছে ৩০ হাজার ২০০ যান্ত্রিক ও ২৭ হাজার ৭০০ অযান্ত্রিক নৌকা। এসব নৌযান ও সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমুদ্রের সর্বোচ্চ ৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ড় মৎস্য আহরণ সম্ভব। কিন্তু আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হলে এর চেয়ে অনেক বেশি গভীর থেকে মাছ ধরে আনা সম্ভব হতো। এক্ষেত্রে দুই ধরনের উদ্যোগ খুব প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করে গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা করা এবং বড় ট্রলারগুলো যেন ৪০ মিটার কম গভীরতায় আসতে না পারে এবং ক্ষতিকর-নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা।

এই ধরনের প্লাস্টিক সমুদ্রের পরিবেশ যেমন দূষিত করছে, তেমনি ঝুঁকি তৈরি করছে মৎস্য খাতের জন্য। এই সমস্যাটি সমাধানে উদ্যোগ প্রয়োজন।

আটকাতে হবে বিদেশী জাহাজগুলোকেও

মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে দেশের জেলেরা মাছ না ধররেও পাশ্ববর্তী দেশের ট্রলারগুলো আমাদের সীমান্তে এসে মাছ ধরে নিয়ে যায়। এটি প্রতিরোধে নৌবাহিনীর জাহাজ ও কোস্টগার্ড নিয়মিত টহল দিলেও সেই টহলের মাঝেই তারা অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশের সীমানায়। গভীর সমুদ্রের বিশাল এলাকায় একসঙ্গে টহল দেওয়া সম্ভব হয় না নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডে।

সুপারিশসমূহ

১. দরিদ্র ও প্রান্তিক জেলে, যারা ছোট নৌকা দিয়ে উপকূলের কাছাকাছি মাছ আহরণ করেন, তাদের এই ধরণের নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখতে হবে।

২. বঙ্গোপসাগরে মৎস ও প্রাকৃতিক সম্পদ, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্রের জন্য বড় হুমকি জাহাজশিল্প, বিদেশি জাহাজের দূষণ ইত্যাদির উপর পরিবেশগত জরিপ (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট) করতে হবে এবং তা প্রতিরোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৩. নদীপথে প্লাস্টিক ও অন্যান্য দূষণ হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

৪. মাছধরার নিষেধাজ্ঞাকালীণ সময়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাসে ভাতা হিসেবে ন্যূনতম ৮০০০ টাকা প্রতি জেলে পরিবারের জন্য বরাদ্দ করতে হবে।

৫. উপকূলের সকল জেলে ও মৎসশ্রমিককে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। শ্রেণী অনুযায় বৃহৎ জেলেনৌকার মালিক, মহাজন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলে, মৎসশ্রমিকদের আলাদা করতে হবে।

৬. নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ায় জেলে প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জেলেদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং সহায়তার অর্থ ব্যংক হিসাবে বা মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি বিতরণ করতে হবে।

৮. উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসুচি পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৯. জেলেদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। তাদেরকে হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল পালনের দিকে না নিয়ে মৎস সম্পদ সংরক্ষণ, বিপণন এবং এ সংক্রান্ত নানা ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজে যুক্ত হবার সুযোগ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে হবে। যেমন বরফ তৈরি, জাল তৈরি ও মেরামত, মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি ও বিপণন সংক্রান্ত ব্যবসা ইত্যাদি।

১০. জেলেদের ঝুঁকি ভাতা ও ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্যোগে কোনও জেলের মৃত্যু হলে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদ সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. সকল মাছ ধরার নৌকার নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদেরকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে ।

১২. মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময় শুরু হওয়ার অন্তত ১৫ দিন আগেই অনুদান নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ও সাধারণ সময়ে বিদেশী জেলেদের বাংলাদেশ সমুদ্রসীমায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে কঠোর নজরদারী নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে।

কোস্ট ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ ফিশ ওয়ার্কার্স এলায়েন্স

যোগাযোগ: বরকত উল্লাহ মারুফ (০১৭১৩৩২৮৮৪০), মুজিবুল হক মুনীর (০১৭১৩৩৬৭৪৩৮)

বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা, ১২০৭।